সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সুফী পদাবলী

Issue cover not available

Vol. 14 | No. 2 | 1970

Check for updates

Volume	14
Issue	2
Year	1970
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	December 1, 1970
DOI	10.62328/sp.v14i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v14i2.4
Pages	153-184
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সুফী পদাবলী

ওয়াকিল আহমদ

মধ্যযুগে মুসলমানের লেখা দু শ্রেণীর রচনার নাম-গোত্র-পরিচয় নিয়ে সমালোচকেরা বড় গোলে পড়েছেন। লেখা দুটি হল সুফী পদাবলী ও পুথি সাহিত্য। পুথি সাহিত্যের এযাবৎ কত নাম দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। ফলে নামের পর নাম বেড়েছে কিন্তু শেষ সমাধান হয়নি। পুথি সাহিত্য ও তার ভাষার নামগুলি এরূপ : দোভাষীপুথি, কলমীপুথি, এছলামি বাঙলা, মুসলমানি বাঙলা, মিশ্ররীতির সাহিত্য, মুসলমানি বাংলা-মাঝিমাল্লার ভাষা, দোভাষী রীতি, বটতলার পুথি, চলতি বাঙলা ইত্যাদি। পুথিগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার ঢঙের জন্য এসব নামভেদ এসেছে। বাংলার সাথে আরবী-ফারসী ও হিন্দী-উর্দুর শব্দ ও বাক্রীতি মিশ্রিত হয়েছে। কেউ কেউ এ শ্রেণীর মিশ্রভাষারীতিকে ব্রজবুলির মত কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বলেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কোন কোন অঞ্চলের এটা মৌখিক ভাষা ছিল। সুতরাং ব্রজবুলির সহিত এর তুলনা চলে না এবং তদনুকরণে একে 'দোভাষীবুলি' কি 'মিশ্ররীতিরবুলি' বলা যায় না। তবে কি বলা উচিত ? সে কথা পণ্ডিতগণ গবেষণা করে নির্ণয় করবেন। আমরা রূঢ়ি অর্থে একে 'পুথিসাহিত্য' বলার পক্ষপাতী। মুসলমানদের রচিত মধ্যযুগের গীতি-কবিতার কৌলিক পরিচয় নিয়েও অনুরূপ নামভেদ দেখা দিয়েছে। গীতিগুলি

বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে রচিত ঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা উপজীব্য হিসেবে গৃহীত। এসব দেখে পদকর্তাদিগকে কেউ বলেছেন 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', কেউ বলেছেন 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি'।[১] পুথির কুবের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামটি ব্যবহার করেছেন। ব্রজসুন্দর সান্যাল চার খণ্ডে মোট ৪৩ জন মুসলমান কবির পদাবলী সংকলন করেছেন। তাঁর যুক্তি হল ঃ "তাঁহাদের ধর্মমত কি ছিল তাহা অভ্রান্তিরূপে জানিতে না পারিলেও তাঁহারা যে প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ছিলেন তাহাতে সংশয় করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না এবং এই জন্যই আমরা তাঁহাদিগকে মুসলমান বৈষ্ণবকবি বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইলাম।"[২] অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে ১০২ জন পদকর্তার প্রায় সাড়ে চারশ পদের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল ঃ "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবকে যাঁহারা বন্দনা করিয়াছেন, চৈতন্যদেবের প্রতি যাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ব্যতীত আর কি বলিব? কৃষ্ণলীলার পদসমূহকে কোন কোন স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌরলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকের বিশেষ অবকাশ নাই। গৌরলীলা পদরচক মুসলমান কবিদিগকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন না বলিবার মত কোন যুক্তিই পাইতেছি না।"[৩] আহমদ শরীফ সাহেব গীতিসংকলনসহ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বৈষ্ণব শব্দটি তুলে দিয়ে এর নামকরণ করেছেন 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য'।[৪] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মুসলমান পদকর্তা' নাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর

১ রমণীমোহন মল্লিক ও ব্রজসুন্দর সান্যাল 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' এবং যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নামে পৃথক পৃথক পুস্তক সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

২ মুসলমান বৈষ্ণব কবি, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, পৃঃ ২৯

৪। দ্রষ্টব্য ঃ সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, ১৩৬৭

অভিমত, মুসলমানদের রচিত যে সমস্ত পদ পাওয়া গেছে সে সবের কতকগুলিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আছে, কতকগুলিতে সুফী মতের প্রভাব আছে, কতকগুলিতে বাউল মতের পূর্বাভাস আছে, কতকগুলিতে নিছক কাব্যরস প্রকাশিত হয়েছে। [১]

মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা বৈষ্ণবপদের ঢঙে কবিতা রচনা করেছেন একথা সত্য, কিন্তু এ ঢঙটা একান্তভাবে বৈষ্ণবদের হতে যাবে কেন? বৈষ্ণবপদগুলি আঙ্গিকে সম্পূর্ণ গীতিকবিতা। চর্যাপদও গীতিকবিতা। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গোটাটাই গীতিকবিতার সমাহার। পরে হিন্দু কবি শাক্ত বিষয়ক গীতিকবিতা লিখেছেন। বাউলদের পদগুলি একাধারে গান, অন্যধারে গীতিকবিতা। গীতিধর্মই বাঙালীর কবি-আত্মার স্বরূপ। সুতরাং তা কোন সম্প্রদায়ের একক সম্পদ হতে পারে না। বিষয়বস্তু ও কূল-পরিচয় নিয়ে যদি এগুলির নামকরণ করতে হয়, তবে তা বৌদ্ধপদ, বৈষ্ণবপদ, সুফীপদ, শাক্তপদ, বাউলপদ হওয়া উচিত। কবিগণকে আমরা বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সুফী, শাক্ত ও বাউল পদকর্তা নামে অভিহিত করতে পারি। চর্যাপদকে 'বৌদ্ধপদ' বলতে কোন বাধা থাকতে পারে না। বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ ও বাউলপদ স্বনামে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেবল গণ্ডগোল 'সুফীপদ' নিয়ে!

অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে যে সাড়ে চারশ' পদের উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে ২৩-২৪টিকে তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ বলে ধারণা করেছেন। এগুলিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেম ও গৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত হয়েছে। পদগুলিতে কবিরা রাধাকৃষ্ণের ভজন গেয়েছেন এবং চরণ শরণ কামনা করেছেন। গৌরপদে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। বাকী অধিকাংশ পদেও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতের প্রকারান্তরে এগুলি 'বিশুদ্ধ' বৈষ্ণবপদ নয়। রাধাকৃষ্ণ থাকা সত্ত্বেও এগুলি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ নয়, তবে কি? শতাধিক বৈষ্ণব কবির শতসহস্র পদ সম্বন্ধে তো এ প্রশ্ন উঠে না। তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব 'মহাজন'; সাধক কবি

১। বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৯

অর্থে 'মহাজন' শব্দের ব্যবহার ছিল। তাঁরা পদরচনা করে পবিত্র ধর্মকর্ম সম্পাদন করতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের রচনায় কোন ফাঁক ছিল না, তা পুরোপুরি তত্ত্বের আদর্শে বাঁধা, ভক্তের আবেগে ভরা। বৈষ্ণবপদ বৈষ্ণবদের শিল্পসৃষ্টিমাত্র নয়, তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার ধন। এগুলিকে তাঁরা অশুদ্ধ, বিকৃত, মিশ্রিত করতে পারেন না। কবিরা তা করেননি। মুসলমান কবিরা যেহেতু মুসলমান, সেহেতু বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বের গভীরে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন না। কেউ হয়ত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিতে পারেন (যেমন যবন হরিদাস বৈষ্ণব হয়েছিলেন), কিন্তু সে খবর আমাদের জানা নেই। আর কেউ যদি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েও থাকেন তবে তাঁকে মুসলমান বলার সার্থকতা কি? কবিরা যে মুসলমান ছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁরা অনেকে সুফী-মতাবলম্বী ছিলেন। সুফীমতের আশুক-মাশুক তত্ত্বের সাথে বৈষ্ণবধর্মের জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। সুফীরা বৈষ্ণবদের মতই সাধক কবি। তাঁরা ছিলেন মরমীয়া সাধক। স্বয়ম্ভূ কৃষ্ণ ভগবান—পরমাত্মা; তিনি মানসলীলার উদ্দেশ্যে জীব সৃষ্টি করলেন, রাধিকা কৃষ্ণের আনন্দশক্তির মানবীমূর্তি। রাধা তথা ভক্ত তথা জীবাত্মার প্রেম দিয়ে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। ভক্তরা প্রেমময় সাধনার পথে ভজন গেয়ে কৃষ্ণকে লাভ করবেন। রাধা যেভাবে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন সেইভাবে পাওয়াই চরম সিদ্ধি। অদ্বৈত দেববাদ ও রাগানুরাগা ভক্তিবাদ হল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সার কথা। গীতা ও ভাগবতে কৃষ্ণ ঐশ্বর্যবান, বৈষ্ণবদর্শনে তিনি রসময়—রসো বৈ সঃ। মুসলমান সুফীতত্ত্বের সাথে এ ব্যাপারে বেশ মিল আছে। সুফীরা প্রেমের পথে জিকির করে আল্লাহকে পেতে চান; শুধু তাই নয়, সাধনার ভেতর দিয়ে তাঁরা আল্লাহর সাথে একাঙ্গ হয়ে মিলে যেতে চান। ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ তাঁদের সাধনার সিদ্ধির লক্ষ্য। সুফীরা নিজেদের 'আশিক' বা প্রেমিক মনে করেন; আল্লাহ হলেন মাশুক, তিনি ভালবাসার পাত্র। মাশুককে সর্বাংশে পাওয়ার জন্য আশিকের আরাধনা। বিশ্বজগৎ খোদারই সৃষ্টি, বিশ্বপ্রাণী খোদার কাছেই ফিরে যাবে। যিনি সাধন-ভজন দ্বারা

স্রষ্টাতে লীন হতে পারবেন তিনিই কামেল বা সিদ্ধ পুরুষ। সুফীতত্ত্বের এটাই মূলকথা। এখানেই অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ আছে। ইসলামের শরীয়ত মতে কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক দ্বৈত। আল্লাহ রসুলকে 'হাবিব' বা বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা এবং বন্ধুত্বভাবাপন্ন হওয়া শরীয়তী ধর্মকর্মের লক্ষ্য। সুফীমত আট শতকের দিকে ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। তের শতকে মুসলমান সুফী দরবেশরা বাংলা দেশে তা বহন করে আনেন। পনের শতকে নব্য বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মে সুফীতত্ত্বের প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। হিন্দুরা বহু দেবতাবাদে বিশ্বাসী। শঙ্কর একেশ্বরবাদের প্রচার করেছিলেন বটে কিন্তু তা ছিল জ্ঞান মার্গীয়। ভক্তিবাদের প্রবাহ মুসলমানদের দ্বারাই সঞ্চারিত হয়। ভারতের মাটিতে চৈতন্য, রামানন্দ, কবীর, নানক, রজব প্রমুখ ভক্তবীরের আবির্ভাব মুসলমানদের আগমনের পরই। সুতরাং অনুমান করা অন্যায় হবে না, সুফীতত্ত্বের প্রভাব চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের উপর পড়েছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সুফীভাব অবাধে প্রবেশ করেছে। দেশীয় মুসলমান সুফীরা তা জানতেন। সে জন্য রাধা-কৃষ্ণকে তাঁদের তত্ত্বের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়নি। বিশ্বের তাবৎ সুফীদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, তাঁরা মরমীয়া সাধনার ক্ষেত্রে স্থানীয় গল্পকাহিনীকে অনায়াসে গ্রহণ করেছেন এবং তারই রূপকে সাধনার বাণী প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। ইরানের কবিরা সুফীতত্ত্বের রূপক হিসেবে ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, খসরু-শিরীন, সলমন-অবসাল, হুমায়-হুমায়ন প্রভৃতি পূর্ব-প্রচলিত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক আখ্যায়িকা গ্রহণ করেছেন। ভারতের কবি মোল্লা দাউদ, সাধন, মনঝন, জায়সী, কুতবন প্রমুখ সুফীসাধক ছিলেন, তাঁদের কাব্য যথাক্রমে চন্দায়ন, মৈনাসত, মধুমালত, পদুমাবত, মৃগাবত রূপকার্থে সুফীতত্ত্বের রহস্য বহন করে। পদুমাবতে কিছু ইতিহাসের উপাদান আছে; বাকীগুলি আঞ্চলিক লোকগাথার ভিত্তিতে রচিত। সুতরাং দেখা যায়, সুফী কবিরা বিষয়

নির্বাচনে মাধুকরীবৃত্তি নিয়েছিলেন। ভাবের অনুকূলে যেখানে যা কিছু পেয়েছেন সেখানেই তাঁরা আলোক-সম্পাত করে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, এবং ধর্ম ও প্রেমপিপাসা নিবৃত্ত করেছেন। বাংলার মাটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাখ্যান একই ভূমিকা পালন করেছে। মুসলমান কবিরা হিন্দুয়ানী বিষয় বলে তা বর্জন করেননি। এ দেশের বুকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবিচ্ছিন্ন ভাটাহীন জোয়ার ছড়িয়ে রেখেছিল। জায়সী রত্নসেন-পদ্মাবতী, দাউদ লোর-চন্দ্রানী, মনঝন মনোহর-মধুমালতী প্রভৃতি প্রেমিকযুগলকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে যেমন 'হিন্দু' হয়ে যাননি, তেমনি বাংলার মুসলমান পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করে 'বৈষ্ণব' হননি।

বাংলার মুসলমান কবিরা বাংলার বাসিন্দা—তাঁরা ধর্মান্তরিতই হ'ন অথবা বিদেশাগতই হ'ন। বাংলার সাংস্কৃতিক প্রবাহ তাঁদের চৈতন্যে রক্তধারার মত বিরাজমান। নতুন-পুরাতন অনবরত তাঁদের মানসলোককে পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট করেছে। এর প্রভাব-প্রবাহকে অস্বীকার করার মানে পুষ্টিকর খাদ্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা। যে মন তা গ্রহণ করেনি, তার রুগ্নতা, নগ্নতা, ভগ্নতা সহজেই ধরা পড়েছে। মধ্যযুগে কাব্য জগতে উপজীব্য বস্তুর বড় অভাব ছিল। তখন কবিদের ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ হয়নি, তাঁরা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নিয়েও গোষ্ঠীভুক্ত কবিদের একজন হয়ে গেছেন। এজন্য কবিদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কাব্যধারা অল্প। অনুবাদ শাখা, মঙ্গলকাব্য শাখা, বৈষ্ণবপদ শাখা ও জীবনীশাখা, মুসলমান প্রণয়োপাখ্যান ধারা, সুফী সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বড় প্রতিভার কবি জন্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিষয়-বস্তুর অভাবে তাঁরা বড় কবি হতে পারেননি, একই ভাবধারার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে অনেকে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, আলাওল, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ প্রতিভায় কোন অংশেই হীনপ্রভ ছিলেন না, কিন্তু শিল্পাদর্শ, ব্যক্তিত্ববিকাশ এবং বিষয়গুণের অভাবের দরুন তাঁরা যথার্থভাবে উজ্জ্বলিত, উৎসারিত হতে পারেননি। মুসলমান সুফী কবিরাও

নতুন বিষয়বস্তুর উদ্ভাবন করতে পারেননি। স্বাধীন বস্তু নির্বাচনের আর্ট তখন জানা ছিল না। সুতরাং তাঁরা রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন; রূপক হিসেবে যে কোন চরিত্রাখ্যান অবলম্বনে সুফীদের মানসগত ও সংস্কারগত বাধা নেই তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। যাঁরা বাধা আছে বলে মনে করেছেন, তাঁরা আরব-পারস্য থেকে বিষয়বস্তু আমদানি করেছেন অথবা নৈর্ব্যক্তিক ভাবমণ্ডলে বিচরণ করেছেন। তেমন পদেরও অভাব নেই। এর সবগুলি মিলিয়েই বাংলার সুফী পদাবলী।

মুসলমানরা 'বৈষ্ণবকবি' বা 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন' হন এতে আমাদের কোন বক্তব্য নেই, তবে রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে কবিতা লিখলেই কবিরা বৈষ্ণব হবেন এমন যুক্তিতে আপত্তি আছে। অবশ্য অনেকে এটাকেই বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসলমান কবিরা যেভাবে কৃষ্ণের চরণ-শরণ এবং নাম আরাধনা করেছেন, তাতে করে তাঁদের ভক্ত বৈষ্ণব না বলার উপায় নেই। কোন কোন কবির ভনিতায় শ্যামের চরণাশ্রয়িতার সুতীব্র আকুতি ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, ইরফান বলেছেন, 'শ্যামের চরণ যেন পাই'।

এরূপ:

নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি।

অথবা

জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবি না একবার।
এবার লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার।।

অথবা

সৈয়দ মর্তুজা ভনে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।

সকল ছাড়িয়া   রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥

কৃষ্ণাসক্তির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে চাঁদ কাজীর পদে। তাঁর আবেদন—

চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥

মীর ফয়জুল্লাহর আর্তি—

মীর ফয়জুল্লাহ ভনে   লাগলি নয়নে
কেমনে ধৈরয ধরি।
শ্যাম সুনাগর   রসের সাগর
তিলেক না দেখিলে মরি ॥

এসব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মুসলমান কবিদের অন্তরে বাস্তবিক কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব কবি বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি বলিতে বাধা নাই।"[১] তাঁর স্থির ধারণা, এমতে কোন ভ্রান্তি নেই। ডঃ এনামুল হক বলেছেন যে মুসলমান পদকর্তারা মুসলমানই, তাঁরা কেবল বৈষ্ণবপদের ঢঙে কবিতা রচনা করেছেন। ডঃ অসিত বাবু ডঃ হকের মতকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসূত তথ্যবিরোধী ও যুক্তিহীন বলেছেন।[২]

রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে কবিতা লিখলে বৈষ্ণব হন না এর প্রমাণ হলেন মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করেছেন। তাঁর একটি ভনিতা :

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে   স্মরি ও রাঙা চরণে
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৭৭
২। ঐ, পৃ: ৭৮০ (পা,টী)।

রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে আশ্চর্য রকমের নকলনবিশী আছে। ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, ভঙ্গিতে এমন এক কুশলী হাত চালিয়েছেন যে তিনি অনেকের চোখে ধোঁয়া দিয়ে সেগুলিকে প্রাচীন কবিতা বলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর শ্যামাসক্তি ও পদবন্দনা বৈষ্ণবদের অনুরূপ। তাঁর ভণিতা:

শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে।

অথবা

জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

অথবা

ভানু কহে, বৃকভানু নন্দিনী, প্রেমসিন্ধু মম কালা।
তাঁহার লাগয় প্রেমক লাগয় সব কছু সহবে জ্বালা॥

এসব পদ রচনা করে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব হননি। নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত হিন্দু রচিত যে কোন শাক্তগানকে অতিক্রম করে যেতে পারে। এতে নজরুল শাক্ত কবি বনে যাননি। আসলে প্রতিভাবান কবি ভাবাপহরণ করে প্রথা ও রীতির অনুকরণে অনায়াসে কলম চালাতে পারেন। বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাব আশ্রয় করে কবিতা-গান লিখেছেন, যেমন দরিয়া সাহেব, কবি শেখ, মইজউদ্দীন, আফসোস, কাইম, সাধন এয়ারী প্রমুখ।[১] কেউ এঁদের বৈষ্ণব বলে দাবী করেন না। রাধাকৃষ্ণ তাঁদের রচনায় রূপক হিসেবে এসেছে। তাঁরা সুফীপন্থার সাধক কবি। সুফী সাধক বাঙালী মুসলমান কবিদেরও 'বৈষ্ণব কবি' বলা অর্থহীন, অযৌক্তিক। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবপদানুসারী সুফীভাবাপন্ন কবি ছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের তালিকা অনুসারে ১০২ জন পদকর্তার বর্ণানুক্রমিক নাম হল: অয়াহিদ, অম্মান, আইনদ্দিন, আকবর, আকবর আলী, আছদ্দিন,

১। আহমদ শরীফ সম্পাদিত—মুসলিম কবির পদসাহিত্য, পৃ: ৩২

আবঝল, আবদুল বারি, আবদুল মালিক, আবাল ফকির, আবুল হুছন, আমান, আরকুম, আলাওল, আলিমদ্দিন, আলি রাজা, আলী মিঞা, আসরফ, ইরকান, ইরপান, উছমান, উদাসী, উম্মর, এবাদোল্লা, ওহাব, কবির শেখ, কবীর, কমর আলী, কাঙ্গালী মির্জা, কালাশা মুন্সী, বেলায়েত হোসেন, খতিসা, খলিল, খাতামা, গয়াজ; গরীব, গোলাম হুছন, চাঁদ কাজী, চম্পাগাজী, ছাওয়াল সা, ছৈয়দ আলী, জালালউদ্দিন, তম্না, তুফানদ্দিন, দুলা মিঞা, দৈখুরা, নজির, নশীর মামুদ, নাকিস্ত, নাছির, নাছিরদ্দিন, নাছির মহম্মদ, ছৈয়দ নিয়ামত, নেমত হোছন, ফএজুর রহমান, ফএজোল্লা, ফজল, ফজলল হক, ফতন, ফতে খান, বক্স আলী, বদিয়ুদ্দিন, বুরহানী, ভিখন, ভেলাসা, মছনতাজ, মতাহির, মর্তুজা, মনুঅর, মনোহর, মহম্মদ আলী, মিয়াধন, মুছা, মোছন আলী, মীর মহাম্মদ, রাজা মোহাম্মদ, মোহাম্মদ, রউফ, রজব, রহিমুদ্দিন, লালন, লালবেগ, লাল মামুদ, শাহ নূর, শীতালং শাহ, সদাই শাহ, সফতউল্লা, সমশের, সালবেগ, মিরতাজ, সুলতান, শেখলাল, শেরচান্দ, হবিব, হাছন রাজা, হানিফ, হাসমত, হাসিম ও হুছন। নামগুলির অনেক বানান শুদ্ধ করে লেখা হয়নি। এঁদের মধ্যে লালন শাহ, শীতলাং শাহ, জালালউদ্দিনকে আমরা বাউল সাধক ও গায়ক বলে জানি। তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা অর্থহীন। আবার অনেকে আছেন অশিক্ষিত পল্লীকবি, বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন। তাঁদের নামও তালিকাভুক্ত করা সংগত নয়। পদাবলী সাহিত্য মূলতঃ মধ্যযুগীয় ফসল, মধ্যযুগের আবহাওয়ায় লালিত কবিমানসের রচনাকেই গ্রহণ করা আমরা যুক্তিসংগত মনে করি। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ সাহেব ঠিকই বলেছেন, "আঠার শতকের পরের কার—বড় জোর উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরে রচিত পদাবলীর কোন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কেননা, যুগ পাল্টে যাওয়ার পরও এ-শ্রেণীর পদ রচনা পিছিয়ে-পড়া মনের পরিচায়ক।·· সাম্প্রতিককালে রচিত পদের এরূপ কোন মূল্য বা গুরুত্ব থাকতে পারে না। এগুলোকে এখন 'লোকসাহিত্য' হিসেবে বিচার

করা উচিত।" [১] যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের তালিকায় মধ্যযুগের কয়েক জন কবির নাম বাদ পড়েছে, যেমন নওয়াজিস খান, বহরাম, শেখ সেরবাজ চৌধুরী প্রভৃতি। মধ্যযুগের যে সমস্ত কবি জীবিত ছিলেন এবং একাধিক ভাল পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় নিলে দেখা যায়, তাঁরা নিষ্ঠাবান সুফী সাধক ছিলেন, তাঁদের কেউ বৈষ্ণব ছিলেন না। পদসাহিত্যের সম্ভবতঃ প্রথম কবি শেখ কবীর। তাঁর 'হোলিখেলা' বিষয়ক একটি মাত্র পদের ভণিতায় সুলতান নসরত শাহের (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) নাম আছে। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায় না। দ্বিতীয় প্রাচীন কবি আফজল আলী। তিনি ভণিতায় ফিরোজ শাহের (১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ) নাম করেছেন। তাঁর একাধিক পদ আছে। তাঁর অন্য গ্রন্থ 'নসিহতনামা'। এতে তাঁর পীরের নাম পাওয়া যায় শাহ রুস্তম। সুতরাং কবি পীর ভক্ত ছিলেন। নসিহতনামায় ইসলামের ধর্মীয় উপদেশ ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন বলে যদি বৈষ্ণবধর্মানুরাগী হন তবে কোরান-হাদিসের অনুসরণে ধর্মীয় উপদেশমূলক কাব্য 'নসিহতনামা' লেখার জন্য তাঁর পরিচয় কি হবে? একই ব্যক্তি যুগপৎ ইসলামধর্মানুরাগী ও বৈষ্ণবধর্মানুরাগী তো হতে পারেন না! শেখ ফয়জুল্লাহ অনেকগুলি পদের রচয়িতা। তিনি পীরভক্ত ছিলেন কিনা জানা যায় না; তিনি ছয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু কোনটিতেই পীরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয়, সত্যপীর, জয়নালের চৌতিশা, সুলতানের জমজমা ও রাগনামা। গোরক্ষবিজয়ের রচনাকাল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং কবি ষোল শতকের মধ্যভাগে কাব্যসাধনা করেছেন। তিনি রূপানুরাগ, বিরহ ও আত্মবোধনের পদ রচনা করেছেন। ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় পুরোপুরি নাথধর্মবিষয়ক কাব্য। গাজীবিজয় ও সত্যপীর মুসলমানদের পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য। সুলতানের জমজমা রসুলের ধর্মীয় বৃত্তান্ত। পদগুলি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা

১। ঐ, পৃঃ ৪০

তাঁকে কোন মতাবলম্বী বলব ? তিনি নাথপন্থী, ইসলামপন্থী না বৈষ্ণবপন্থী ? সুধী পাঠকই তা বিচার করে দেখবেন। সতের শতকের সৈয়দ সুলতান বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি পীরভক্ত সুফী সাধক ছিলেন। শাহ হুসেন তাঁর পীর ছিলেন। তাঁর মারফতী গানগুলিতে বিশুদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কবির সুবৃহৎ গ্রন্থ 'নবীবংশে' মুসলমান পয়গম্বরদের জীবনী ও ধর্মীয় তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কবি অবতার হিসেবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হরি প্রভৃতি হিন্দু দেবতাদের তথ্যও সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ যথাক্রমে শব-ই-মেরাজ, রসুলবিজয়, ওফাৎ-ই-রসুল, ইবলিসনামা, জ্ঞান-চৌতিশা, জ্ঞান-প্রদীপ ইসলামের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত। শেষের গ্রন্থ দুটিতে সুফী যোগসাধনা ও দেহতত্ত্বের কথা আছে। এখন রচনার ধারা বিচার করে কবিকে কোন মতের পরিপোষক বলব! আহমদ শরীফ সাহেব সৈয়দ সুলতানের চৌদ্দটি পদ সংকলিত করেছেন। পদগুলি রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ে রচিত। এ কয়টি পদের বিচারে তিনি যদি বৈষ্ণবভাবাপন্ন হন তবে নবীবংশে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-হরিকে অবতার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য হিন্দুধর্মানুরাগীও হবেন। ইসলামের শরীয়ত ও সুফীমতের কথা তাঁর অধিকাংশ রচনাতে আছে। অতএব তিনি খাঁটি মুসলমানও। একজন ব্যক্তি একাধিক ধর্মমতে অনুরাগী হতে পারেন না, মধ্যযুগে তা অকল্পনীয় ছিল। যদি তিনি ধর্মসমন্বয়ের জন্য লিখে থাকেন, তবে সেটা তাঁর মানসিক উদারতা ও মহত্ত্বের লক্ষণ, ধর্মত্যাগের লক্ষণ নয়। সৈয়দ সুলতান স্বধর্ম ত্যাগ করে 'বৈষ্ণবধর্মানুরাগী' হননি। ঐ শতকের মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেছেন। ব্রজসুন্দর সান্যাল 'মুসলিম বৈষ্ণব কবি' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে তাঁর ৫টি পদ সংকলিত করেছেন। আহমদ শরীফ সাহেব 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থে প্রায় ১৪টি পদ উদ্ধৃত করেছেন। পদগুলির নীচে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। আলাওল রাগ-তালনামা' লিখেছেন।[১] তিনি রোসাঙ্গে আসার পর কিছুকাল গানের

১। দ্রষ্টব্য : আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের রাগতালনামা।

শিক্ষকতা করেছিলেন। রাগতালনামা এবং পদাবলী সেই সময়ের রচনা হতে পারে। একান্তভাবে সংগীতচর্চার উদ্দেশ্যে এগুলি লিখিত হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ পদ্মাবতী (হিন্দী ভাষার সুফীতত্ত্বের রূপক কাব্যের অনুবাদ), সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ), সপ্তপয়কর (ফারসী ভাষার সুফীতত্ত্বের রূপক কাব্যের অনুবাদ), তোহফা (ফারসী ভাষার ধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ) এবং সেকান্দরনামা (ফারসী ভাষার ঐতিহাসিক কাব্যের অনুবাদ)। আলাওলের আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি সুফীমতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁর পীর ছিলেন সউদ শাহ। কবি শেষ জীবনে 'কাদেরী খিলাফত' পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আলাওল কেমন করে 'বৈষ্ণব কবি' হন তা ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় জানেন, আমরা জানি না। মুর্শিদাবাদের স্বনামখ্যাত পীর, আধ্যাত্মিক গীত ও যোগতাত্ত্বিক কাব্য প্রণেতা সৈয়দ মর্তুজা অনেকগুলি পদ রচনা করেছেন। আঠার শতকে বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' নামক সংকলন গ্রন্থে তাঁর একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ব্রজসুন্দর সান্যালের গ্রন্থে ২২টি পদ গৃহীত হয়েছে। কিংবদন্তী আছে, তিনি আনন্দময়ী নাম্নী এক ভৈরবীকে সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। তাঁর যোগকলন্দর আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের গ্রন্থ, এতে ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সাথে ইরাণীয় সুফীশাস্ত্রের মিশ্রণ ঘটেছে। তিনি ফারসী গজল লিখেছেন, তাতে বিশুদ্ধ মারফতী সুর ধ্বনিত হয়েছে। কবির পীর ছিলেন সৈয়দ আবদুর রজ্জাক শাহ। বর্তমানে জঙ্গীপুরের 'হারুয়া' গ্রামে এখনও কবির স্মৃতি উদ্দেশ্যে মুরিদ কর্তৃক 'উরস' উৎসব পালিত হয়।[১] মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরী তাঁর ঐতিহাসিক

১। ডঃ এনামুল হক জঙ্গিপুর থানার সুতীগ্রামে কবির উরস হয় বলে জানিয়েছেন। (মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ: ১৯১)। কিন্তু তথ্যটি ভুল। জঙ্গিপুর বলে কোন থানার নাম মুর্শিদাবাদে নেই, আছে রঘুনাথগঞ্জ থানা। এটি জঙ্গিপুরের আওতাভুক্ত থানা। 'সুতী' গ্রাম নয়, থানার নাম; এটি জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ মর্তুজার কবর ছিল 'ছাপঘাটি' নামক একটি গ্রামে। পরে গঙ্গায় ঐ গ্রামের অংশবিশেষ ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁর মাজার বর্তমানে হারুয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়।

গ্রন্থ 'খজিনাতুল আফ্‌সিয়ায়' সৈয়দ মর্তুজাকে 'গজল গায়ক দরবেশ' বলে উল্লেখ করেছেন। [১] এর পর কবিকে 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন' ভাবা উচিত নয়। রাধাকৃষ্ণকে তিনি রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আরাধ্য দেবতা হিসেবে নয়। আঠার শতকের কবি নওয়াজিস খান কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। তিনি গুলেবকাওলী (প্রণয়োপাখ্যান), পাঠান প্রশংসা (প্রশস্তিমূলক রচনা), জোরওয়ার সিংহকীর্তি (প্রশস্তিমূলক রচনা) বয়ানত (উপদেশমূলক খণ্ড কবিতা) প্রভৃতি রচনা করেন। কবি পীরভক্ত ছিলেন। তাঁর পীরের নাম মৌলভী আতাউল্লা। তাঁর গীতাবলীতে সুফীবাদী অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। আহমদ শরীফ সাহেব 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থে নওয়াজিসের ভণিতায় যে পাঁচটি পদের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটিতে বৃন্দাবনের পটভূমিকা আছে, বাকীগুলিতে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবেশ রক্ষিত হয়েছে। তিনি বৈষ্ণবদের পদানুসরণে গান লিখলেও কেবল সেটুকুর ভিত্তিতে আমরা তাঁকে বৈষ্ণবভাবাপন্ন বলতে পারি না। শাহ আকবর, নসীর মাহমুদ, সালবেগ, আইনুদ্দিন প্রমুখ কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ লিখে সুনাম অর্জন করেছেন; তাঁরাও ব্যক্তিগত জীবনে সুফী সাধক ছিলেন। শাহ আকবরের শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যে আইনুদ্দিন অন্যতম ছিলেন। তাঁর বহুসংখ্যক উন্নত শ্রেণীর পদ পাওয়া গেছে। এঁদের কারো বৈষ্ণব বনে যাওয়ার মত নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই। ডঃ এনামুল হক এক স্থানে লিখেছেন, "এই মুসলমান পদকর্তাদিগকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ছিল বলিয়া মনে করা শুধু যে অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহা যুগধর্মের প্রতি অবিচারও বটে। কারণ এই পদকর্তাদের অনেকেই যে গোঁড়া মুসলমান থাকিয়া খাঁটি ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।" [২] আমরা তাঁর মত যুক্তিসংগত এবং গ্রহণযোগ্য মনে করি; এ সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য পূর্বেই উপস্থাপিত করেছি।

১। মুসলিম কবির পদসাহিত্য, পৃঃ ১৭২

২। মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ১৭৭

বৈষ্ণবপদরীতিতে যিনি প্রথম বাংলা কবিতা লিখেছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, শাক্ত ছিলেন। তিনি হলেন বাসুলি দেবীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি চৌদ্দ শতকের শেষ অথবা পনের শতকের প্রথম দিকের কবি হবেন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একখানি আখ্যানকাব্য বটে তবে বিচ্ছিন্নভাবে পদগুলি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ গান এজন্য যে প্রতিটি পদশীর্ষে পৃথক পৃথক রাগতালের নাম আছে। তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি, তাঁর কাব্য লৌকিক প্রেমরসে ভরপুর, অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। এতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। দু এক জাগায় কৃষ্ণকে যোগীবেশ দেওয়া হয়েছে। এতে সহজিয়া তান্ত্রিক মতের সাধক বড়ু চণ্ডীদাসের যোগসাধনার প্রভাব থাকতে পারে। ঐ একই ঢঙে পদ লিখে পরবর্তী যিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি বৈষ্ণব নন, বাঙালীও নন, তিনি মৈথিলি শাক্ত কবি বিদ্যাপতি। তাঁর কাব্যের ভাষা ব্রজবুলি। বৈষ্ণবপদে ব্রজবুলির ব্যবহার পরে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি কীর্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, শৈবসর্বস্বসার প্রভৃতি গ্রন্থের সাথে বিক্ষিপ্তভাবে ব্রজগীতি রচনা করেন। তাঁর পদগুলিও আদিরসাত্মক, লৌকিকভাবাশ্রিত; এগুলিতে আধ্যাত্মিক গুণ নেই। চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে যশোরাজ খানের আবির্ভাব হয়; তিনি ভণিতায় হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) উল্লেখ করেছেন। পদটির ভাষা ব্রজবুলি, ভাব কৃষ্ণানুরাগ। কৃষ্ণকে দেখার জন্য রাধা বেশবাস ও রূপসজ্জা অসমাপ্ত রেখে বাহির দেহলীতে পদচারনা করছেন—একজন সখী কৃষ্ণের কাছে সে চিত্র বর্ণনা করছে। পূর্ণ পদটি এরূপ :

এক পয়োধরে চন্দন লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভুধর
কোরে মিলল জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।

আধ পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চান্দ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সেহি ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান ॥

পদটি ভাবমাধুর্যে ও ভাষালালিত্যে অপূর্ব। এতে বাস্তব প্রেম আছে, ধর্মব্যঞ্জনা নেই। যশোরাজ খানের অন্য কোন রচনা পাওয়া যায়নি; তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও অজ্ঞাত। খুব সম্ভব, তিনি হুসেন শাহের দরবারে রাজকর্মচারী ছিলেন। নবদ্বীপের দুলাল শ্রীচৈতন্য তখন পূর্ণ যুবক; তাঁর সঙ্গে কবির যোগাযোগের কোন সূত্র নেই। যশোরাজের অব্যবহিত পরে শেখ কবিরকে পাওয়া যায়। তিনি নসরত শাহের (১৫১৯-৩১ খ্রীঃ) নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর পদও একটি: এতে নারীদেহের (রাধার) অপূর্ব রূপবর্ণনা আছে। পদটি এরূপ:

অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজ গমনী ধনি ধনি ॥
কাজল রঞ্জিত নয়ন ধনি ধবল ভালে।
ভোমরা ভোলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কর ধনি খিন অতি মাঝাখানি।
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িব যৌবনী ॥
সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি।

আমিয়া বরিষে জানি জৈসে শরদে পূরণ শশী ॥
সেক কবির ভণে অহি গুণ পামরে জানে ।
ছুলতান নছির সাহ ভুলল কমল বনে ॥

পদটিতে স্পষ্ট করে রাধার নাম নেই; 'ধনি' বলতে যে কোন রমণী হতে পারেন, কিন্তু সেযুগে সাধারণভাবে রাধাকে বুঝাতে শব্দটির ব্যবহার ছিল। এখানে নারী অঙ্গের রূপসৌন্দর্য আছে, এতে ধর্ম নেই। শেখ কবির মুসলমান কবি। বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তনায় বৈষ্ণবধর্ম্ম তখন দানা বেঁধে উঠেছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর সামান্য আগে-পরে আর একজন মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন আফজল। নামের বানানের কিছু পার্থক্যসহ আফজলের একাধিক পদ পাওয়া গেছে। কেবল ফিরোজ শাহের (১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ) নামযুক্ত ভণিতার পদটি এখানে উল্লিখিত হল :

সব ঋতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত ।
বিরহিণী ক্ষীণ তনু মদনে চিন্তিত ॥
আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব শর ।
মনোজ সারথি লইয়া সঙ্গে ॥
তরু সব হরষিত সতত যে পুলকিত ।
দশদিক শোভে নানা রঙ্গে ॥
ফিরএ কন্দর্পবর হাতে লইয়া ধনু শর
সমীর তুরঙ্গে সোয়ার ।
নানা তরু লতা ফুলে শিরীষ চামর দোলে
ষটপদ যন্ত্রের ঝঙ্কার ॥
কহে আফজল হিত বরিখে মাধবী ঋত
নিবারিতে কাম দুঃশাসন ।
সৈয়দ ফিরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা
ভজ সখি কুরঙ্গ চরণ ॥

এটি রাধাবিরহের পদ। বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতিলোকে যখন মিলনানন্দের সাড়া, তখন রাধা বিরহে কালযাপন করছেন। তিনি কামপীড়ায় বিধুরা। বসন্ত ঋতুর সমাগমে প্রকৃতি ও মানবের অন্তরের বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন কবি। এতে ধর্মের নামগন্ধ নেই। চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে তাঁর পার্ষদগণ এবং চৈতন্যোত্তরযুগে ভক্ত বৈষ্ণবগণ পূর্বের এই রীতিতে অসংখ্য পদ রচনা করে গীতিস্রোতের অবাধ ধারা প্রবাহিত করেন। ঢঙটি অভিন্ন রইল, ভাবে পরিবর্তন এল—চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্গূঢ় রসতত্ত্ব ব্যঞ্জনার্থে সংস্থাপিত হল। এই আদর্শে স্বয়ং চৈতন্যদেব ও রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার থেকে শুরু করে, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, অনন্তদাস ইত্যাদি শতাধিক কবির সহস্রাধিক বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি, বৈষ্ণবপদের ঢঙ বা আঙ্গিক বৈষ্ণবদের নিজস্ব আবিষ্কার নয়; বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পূর্বেই ঐ ঢঙে পদ রচনা শুরু হয়েছিল। রচনার প্রাচুর্যে ও ভাবসমৃদ্ধে তা যেন বৈষ্ণবদের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। প্রাক-চৈতন্যযুগে মুসলমান কবি ঐ রীতিতে পদ রচনা করেছেন, তাতে তাঁরা যদি বৈষ্ণব না হন তবে চৈতন্যোত্তরযুগেও পদ রচনা করে তাঁদের কেউ বৈষ্ণব হবেন না। আমরা তাঁদের রচনাকে বৈষ্ণবপদ না বলে বড় জোর 'পদসাহিত্য' বলতে পারি। তারপর বস্তুধর্ম দিয়ে সেগুলি নিছক পদসাহিত্য, না সুফীমতের সুফীপদ তা বিচার করে নির্ণয় করা যাবে।

বাহির থেকে দেখলে মুসলমান কবিদের রাধাকৃষ্ণলীলাশ্রিত পদগুলির কয়েকটি বিভাগ পাওয়া যায়, যেমন রূপ, অনুরাগ, বংশী, আক্ষেপ, দান, নৌকা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, আত্মবোধন, আত্মনিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি। এছাড়া মিশ্রভাবের কিছু পদ, বাৎসল্যরসের পদ ও গৌরলীলার পদ আছে। এর পাশে বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এগুলি ছাড়া আরো বিচিত্র লীলাবিষয়ক পদ আছে, যেমন বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, রাসলীলা, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি। এগুলির আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

নানা উপবিভাগ আছে। রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বিভিন্ন স্তরের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। কবিরা পদ রচনা করার সময় এ সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রেখে কলম চালাতেন। ফলে খাঁটি বৈষ্ণবপদে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের কোন একটি ব্যঞ্জনা অবশ্যই পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মানবিক নয়, আধ্যাত্মিক লীলা—এ অর্থটা তাঁরা নানাভাবে বুঝাতে চেয়েছেন। ভাবরহস্য, চরিত্র-ব্যাখ্যা, শব্দব্যঞ্জনার মধ্যে তাঁদের সে প্রয়াস নিহিত আছে। মুসলমান কবিরা এত সূক্ষ্ম বিভাগের মধ্যে প্রবেশ করেননি; তাঁদের রচনায় বৈষ্ণবদর্শনের প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা নেই। আর এখানেই আছে বৈষ্ণব-মুসলমান কবিদের পদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। মুসলমান কবিরা খুব জোর, সুফীমতের রূপকার্থ আরোপ করে পদ রচনা করতে পারেন, কারণ তাঁরা অনেকে সুফী সাধক ছিলেন। অনেক পদে এরূপ অর্থ আবিষ্কার করা যায়। তাঁরা রাধাকৃষ্ণকে আশিক-মাশুক তত্ত্বের রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নিজ চিন্তার আলোকে রাধাকৃষ্ণলীলার যে যে অংশ গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করেছেন, যে যে অংশ বর্জনীয় তা বর্জন করেছেন। বৈষ্ণবরা সম্ভোগলীলা, হোলি-খেলা বা রাসলীলা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি আদিরসাত্মক অংশেও অধ্যাত্মরসের মোড়ক দিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ অভেদাত্মা, একাত্মার মিলনে অশ্লীলতা নেই। তাছাড়া জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে চায়, প্রেমময় মিলন সর্বোত্তম, প্রেমসাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা। মুসলমান কবিরা আদিরসাত্মক প্রেমসাধনায় বিশ্বাসী নন, তাঁরা জ্ঞানমার্গীয় প্রেমসাধনায় বিশ্বাসী। সুফীরা দেহতত্ত্বের সাধনাতেও নারীকে বর্জন করেছেন। কায়াসাধনার দ্বারা চিত্তসংযম ও আত্মবোধনের উন্মেষই তাঁদের লক্ষ্য। সুতরাং তাঁরা ঐসব অংশ উপেক্ষা করে গেছেন।

মুসলমান পদকর্তার রচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যে সুফীতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তার প্রকৃত স্বরূপ কি? সুফীমতে আল্লাহ হলেন প্রেমময়, সৌন্দর্যময় এবং সত্যময়। তিনি অবিনশ্বর ও শাশ্বত। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করলেন; মানুষ হল জীবশ্রেষ্ঠ। তারা আল্লাহর শেকেলের ছায়ারূপ।

আল্লাহ অরূপ, মানুষ শরীরী। সুন্দর ও প্রেমের ধ্যান করে আল্লাহতে সমাগত হওয়াই বান্দার উদ্দেশ্য। রূপসাধনা ও প্রেমসাধনা দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার মিলনসেতু রচিত হয় বলে প্রেমের বিচিত্র স্তর তাদের ধ্যান-ধারনায় প্রকাশ পায়। অনুরাগ, মান, অভিমান, মিলন, বিরহ ইত্যাদি ভাবাবেগ বান্দার জীবনে সঞ্চারিত হয়। সুফীরা সাধারণতঃ ঈশ্বরকে সৌন্দর্যের সারভূতা নারীরূপে ধ্যান করে। বৈষ্ণবরা কৃষ্ণকে পুরুষরূপে ধ্যান করে। শুদ্ধ প্রেমের পথে সৌন্দর্যময়ীকে লাভ করা যায়। সকাম প্রেম সুফীমতে নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব সহজিয়ারা সকাম প্রেমসাধনা করে থাকেন। সুফীরা ভারতীয় প্রভাবে কায়াসাধনা করেন বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ যোগপ্রক্রিয়ায় আত্মশুদ্ধি ও চিত্তসংযমের সাধনা। আত্মপ্রেম পরিণামে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়ে সাধককে তুরীয় মার্গে নিয়ে যায়। তখন তাঁর আত্ম-পর ভেদ থাকে না, তিনি হন 'কামেল ইনশান'; তিনি 'আনাল হকে'র স্তরে উত্তীর্ণ হন। মুসলমান বাউলরা দেহকেন্দ্রিক প্রেমের পথে সাধনা শুরু করে দেহাতীত প্রেমে পৌঁছতেন। বাউলরা বাউলই, সুফী নন। সুফীদের আগাগোড়া লক্ষ্য অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মপ্রেম। সুফীরা যে আল্লাহর সাথে প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করে জিকির করেন তাতে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে প্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাঁরা প্রেমরস পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করে থাকেন। বৈষ্ণবদের সাথে সুফীদের ভাবদৃষ্টির এখানেও একটা পার্থক্য আছে। বৈষ্ণবরা ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণপ্রেম তথা ভগবৎপ্রেম আস্বাদন করেন না, রাধাভাবে নিজেদের রূপান্তরিত করে তবে সেই প্রেমের স্বাদ পান। নচেৎ চরম আস্বাদন সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি' নয়, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি' ভগবদ্‌প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ। ব্যক্তিত্বলোপের দ্বারা বৈষ্ণবের প্রেমসাধনা, ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ আস্বাদনে সুফীর অধ্যাত্মপ্রেমের প্রকৃত সফলতা। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "বৈষ্ণবের মতে রাধাকৃষ্ণের যত লীলা তাহার ভিতর মানুষের কোন স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে; জীব সেখানে লীলা পরিকর-ভূত

স্বাক্ষীমাত্র, সে দূর হইতে লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলা কীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপিগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোন অধিকার নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবাসনাও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।…কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে, কারণ তাঁহারা চৈতন্য প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিলেন; একটা সাহিত্যিক বিষয়বস্তু এবং প্রকাশ-ভঙ্গিও উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোন স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি।…বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সুফীপন্থী। সুফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের বহুরূপে লীলা—ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। …সুফীপ্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাংলা দেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়-জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণের পূর্বরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থলে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।"[১] ডঃ দাশগুপ্তের মতে, মুসলমান কবিগণ প্রেমের ত্রিবিধ ধারার সংমিশ্রণে পদসাহিত্য রচনা করেছেন—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভগবৎ প্রেমোপলব্ধি, জনসংসর্গের সহজ

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ: ৩২১-৩০

প্রেমধর্মোপলব্ধি এবং সুফীপন্থায় অধ্যাত্মপ্রেমোপলব্ধি। বাংলার মাটিতে এ এক নব প্রেমচেতনা, নব প্রেমাস্বাদন।

বৈষ্ণবপদের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে বটে, কিন্তু কবিগণ এর জন্য কোন প্রতীক শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করেননি। মুসলমান পদকর্তারা পরিভাষার মাধ্যমে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাছে স্থান-কাল-পাত্র প্রতীক অর্থে গৃহীত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ, শাশুড়ি-ননদ, মথুরা-বৃন্দাবন, যমুনা, বসন্ত বাহ্যার্থ ছাড়াও বিশেষ অর্থ বহন করে। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেহতত্ত্বের পরিভাষা এবং ইসলামী শব্দও অকপটে ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ সুফীর 'আশিক-মাশুক' ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈষ্ণবের প্রেম সুফীর 'ইশকে'র সমতুল। বিরহ-মিলনের মধ্যে 'হিজরান' ও 'বিশালে'র সংকেত আছে। শাশুড়ি-ননদাদি আত্মীয়তাবাচক শব্দেরও একটা প্রতীকী অর্থ ছিল। আফজল আলীর 'নসিয়তনামা' গ্রন্থে এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি পীরগুরু শাহ রুস্তমের মুখে প্রশ্নোত্তরের ছলে লিখেছেন,

ভোগেরে শাশুড়ী বলে, ননদী কাল।
মনেরে সতীন কহে, মায়া জান জাল॥
ক্ষমারে বোলয়ে সই শরীর মাঝারে।
খসম বোলয়ে জান রুহু আমিনরে॥
দেওর বলে রুহু যার জান হয়।
ভাশুর বোলয়ে রুহু মুকীম নিশ্চয়॥
এহি অষ্টজন জান শরীরেত হয়।
এক জনে এক কর্ম করিতে আছয়॥[১]

আফজল আলী চৈতন্য পূর্ববর্তী পদকর্তা হতে পারেন। কবি গয়াস 'রূপে'র একটি পদে 'দিল্লী ইসলামপুর' প্রতীক নিয়ে এসেছেন। তাঁর পদের শুরু

১। উদ্ধৃত: মুসলিম কবির পদসাহিত্য, পৃ: ১৫৬

'বাহির হইয়া দেখরে রাধা বিনোদ রায় সাজে।' এতে ও অন্যান্য চরণে বৈষ্ণবীয় আবহ বিরাজমান। তারপর মাঝের একটি চরণে লিখলেন, 'দিল্লীর আগে বিস্তর দূর তার মাঝে ইসলামপুর তাতে কামকানু করে কেলি।' বৈষ্ণব কবিরা হাজার হাজার পদ লিখেছেন, কোথাও এ ধরণের বাক্য লিখেননি। গয়াস খান গৌররূপ বা কৃষ্ণরূপের অনুকরণে 'নবীরূপ' বর্ণনা করে পদ লিখেছেন। পদটির অংশবিশেষ এরূপ :

হালিমা তুয়া বর ভাগ্য এ বিশেষ।
আল্লার পরম সখা মনুষ্য মূরতি লেখা
দুগ্ধ পিএ বালকের বেশ ॥
নবীর মুখের হাসি যেন পরতেক শশী
দেখিতে যেহেন লাগে সূর।
সুন্দর নখের ভাতি যেন চান্দ পাঁতি পাঁতি
লাজে তিমির ভেল দূর ॥
নবীর গায়ের কান্তি গগনে চমকে জুতি
পদতলে অরুণ লুকায়।
খান গয়াসে ভণে আরব কোরেশগণে
ভজ গিয়া অহি রাঙা পায় ॥[১]

নওয়াজিস খানও অনুরূপ পদ লিখেছেন।

সৈয়দ মর্তুজার একাধিক পদে দেহতত্ত্বের আভাস আছে। তিনি 'যোগকালন্দর' নামে দেহতত্ত্ববিষয়ক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থই লিখেছিলেন। তাঁর পদে এর প্রভাব বা চিহ্ন থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর 'আক্ষেপে'র একটি পদের দুটি চরণ :

ঐ কূলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী।
উড়ি যাইতাম সাধ করে পাখা না দেয় বিধি ॥[২]

১। ঐ, পৃঃ ৪২
২। ঐ, পৃঃ ৮৩

'মানে'র ছুটি চরণ :

আড়ালা চাউলের ভাত ক্ষীর নদীর পানি।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি ॥[১]

আক্ষেপ কৃষ্ণের, মান রাধার। ক্ষীরনদী দেহতত্ত্বের পরিভাষা। বাউলরা এ ধরণের অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন। নারীরজঃ 'নীর' ও পুরুষশুক্র 'ক্ষীর' রূপে কল্পনা করা হয়। বাউলদের মতে, মানবদেহে নীর-ক্ষীর একত্রে বিরাজ করে। নীরে-ক্ষীরে মিলন-সাধনেই প্রেমানন্দের আস্বাদন।[২] নীর-ক্ষীরের উৎস হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র। দেহস্থ ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীতে তা প্রবাহিত। সৈয়দ মর্তুজা 'ক্ষীরনদী' বলতে দেহসাধনার এই তত্ত্বকেই জ্ঞাপিত করেছেন। বাংলার সুফীরা যোগসাধনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। একই কবির যোগতত্ত্ব ও সুফীতত্ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তকই তার প্রমাণ।

রাধাকৃষ্ণকে প্রতীক বা রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছিল এ সম্পর্কে কোনই দ্বিধা থাকে না যখন কবির মুখে শুনি, 'রাধাকানু আপনার তনেরে।' উক্ত কবি এর ব্যাখ্যায় পরিষ্কার করে বলেছেন, 'তন রাধা মন কানু শাহ নুরে বলে।' কবি ওসমানের কণ্ঠে একই ধ্বনি শোনা যায়। তিনি লিখেছেন,

রাধাকানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্রিদিন ॥
কানুরাধা এক ঘরে সদাই করে বাস।
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ ॥

বৈষ্ণব সহজিয়া মতের এখানে প্রতিধ্বনি আছে; এটাই বাউল কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। বাউলরা যে 'মনের মানুষে'র খোঁজ করে তার অধিবাস দেহেই। এজন্য দেহকে জানলে 'মন মনুরায়'কে জানা যায়।

১। ঐ, পৃঃ ১৪১।
২। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃঃ ৩৭৪

সৈয়দ মর্তুজা আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। তিনি 'তনে-মনে' কোন ভেদ রাখেননি।

আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি মওলা গোপতের চিন।
পুরান পিরীতখানি ভাবিলে নবীন॥

উল্লেখযোগ্য যে, শাহনুর, ওসমান ও মর্তুজা তন, মন, বাদাম, মওলা প্রভৃতি যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলি বৈষ্ণবপদের অনুসরণ করলেও এগুলির ভাবপরিমণ্ডলে ভিন্ন সুর জেগেছে। দেহতত্ত্বের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে আলী রজার পদে।

রাধা কানু লীলায় পিরীত।
প্রেম বশে গাহে যন্ত্র গীত॥
রাধিকার কায়মন ঠাকুরের বৃন্দাবন
ষড় ঋতু রাগ তথা বৈসে।
ছয় চক্র জ্ঞান-ঘর তাতে সপ্তসরোবর
রাজহংস শত শত ভাসে।

অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নেই। ভাবের মধ্যে যে কোন বাস্তব নারীর আর্তি জেগেছে। সিরতাজের ভণিতায় এরূপ একটি পদাংশ :

সই সই কহিতে খাঁখার পিয়ার বেভার
শুন প্রাণ সইরে॥ ধুয়া
সই সই কি মোর রান্ধন কি মোর বাড়ন
কি মোর হলদি বাটা।
মনের আগুনে বনে যাইমু
রাখিমু সোয়ামীর খোঁটা॥
সই সই গাছে ধরে ফল নারাঙ্গি কমল
বাতুরে চিয়ুয়া খায়।

আমার সোয়ামী হালিয়া গোঁয়ার
সুতিলে সে নিদ্রা যায় ।।
সই সই যাহার সোয়ামী রসিয়া নাগর
সে নারীর কিসের দুখ।
দিনের পাপ খানি দিনেতে খণ্ডাইব
দেখিয়া সে চান্দ মুখ ।।···

পদটির পশ্চাদভূমিতে রাধার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় সত্য, কিন্তু শব্দ নির্বাচন ও বাক্যগঠনে যে ভাবলোক রচিত হয়েছে তাতে কোন ক্রমেই বৈষ্ণবীয় রসানুভূতি জাগে না। 'হলদি বাটা'র চিত্র বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদে নেই। এতে জীবন-জিজ্ঞাসা প্রাধান্য পেয়েছে। শব্দ নির্বাচন, প্রতীক গ্রহণ, ভাবাবহ, সুরধ্বনি ইত্যাদি ব্যাপারে বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় মুসলমান কবির পার্থক্য সতর্ক পাঠে এমনি ভাবেই প্রকট হয়ে উঠে।

তত্ত্বলোকে প্রবেশ করলে দেখা যায়, বৈষ্ণব ও মুসলমান কবিরা রূপানুরাগের পদ লিখেছেন, কিন্তু পূর্বানুরাগের পদ কেবল বৈষ্ণবেরা লিখেছেন। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত কবিতা 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।।' পূর্বরাগের দৃষ্টান্ত। শ্যামকে রাধা চোখে দেখেননি, কেবল নাম শুনেই তাঁর প্রতি প্রেমাসক্তা হয়েছেন। পার্থিব জীবনে নরনারী পরস্পরের রূপগুণে আকৃষ্ট হয়ে প্রণয়াবদ্ধ হয়। নাম শুনা মাত্র কেউ প্রেমাকর্ষণ অনুভব করে না। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লৌকিক নয়, তাঁদের পরিচয়ও নতুন নয়; তাঁরা যুগযুগান্ত ধরে পরস্পরের কাছে পরিচিত। দেহের আড়ালে দ্বৈতরূপ বটে কিন্তু আত্মারূপে তাঁরা অভিন্ন। সুতরাং নাম শুনা মাত্র পূর্বচৈতন্যোদয় ও মিলনাকাঙ্ক্ষা সুতীব্র হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বৈষ্ণবধর্মের এই অদ্বৈতবাদের আলোকে পদটি বিধৃত। সুফীমতে স্রষ্টা ও বান্দার মধ্যে একাত্ম মিলনের আকুতি ব্যক্ত হলেও উভয়কে এক সত্তারূপে কল্পনা করা হয়নি। সাধক কবি পার্থিব উদাহরণ দিয়ে বলেছেন দুধের মধ্যে মাখন আছে, কিন্তু দুধ ও মাখন এক বস্তু নয় অথবা সমুদ্রের বুকে

ঢেউ আছে কিন্তু সমুদ্র ও ঢেউ এক জিনিষ নয়, আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক ঠিক সেইরূপ। তাঁরা আরও বললেন, বৃক্ষ থেকে ফল ও বীজ হয়, বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম হয়। আল্লাহ থেকে বান্দার সৃষ্টি, মৃত্যুর পর বান্দা আল্লায় লীন হয়, কিন্তু আল্লাহ ও বান্দা স্বরূপতঃ ভিন্নই। এটা খানিকটা দ্বৈতাদ্বৈতের সম্পর্ক। সৃষ্টিরূপে জীব আল্লাহ থেকে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা। এ অবস্থায় তার ইন্দ্রিয়াতীত রূপাসক্তির কথা আসে না। মুসলমান পদকর্তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনের ভিত্তিতে রূপানুরাগের পদ লিখেছেন।

বৈষ্ণবপদে ও সুফীদের লেখায় 'বাঁশী' স্থান পেয়েছে। ইরানের সুফীসাহিত্যে বাঁশীর বিশিষ্ট স্থান আছে। মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী বাঁশীকে জীবাত্মা-স্বরূপ কল্পনা করেছেন। বাঁশ থেকে বাঁশীর উৎপত্তি; কিন্তু বাঁশ ও বাঁশী অভিন্ন জিনিষ নয়। বাঁশীতে যে সুর বাজে তা বেণুকুঞ্জেরই প্রতিধ্বনি। বাঁশী সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য বিলাপ করছে। অর্থাৎ মানবাত্মা পরমাত্মায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল সুরধ্বনি তুলছে। জিকির বা ভজন সেই আকুল গুঞ্জরণ। রুমী এটাকেই বাঁশ-বাঁশীর রূপকে তাঁর অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

বোশনো আয্ নায়, চুঁ হেকায়েত মীকুনাদ,
ও আয জুদায়ী হা শেকায়েত মীকুনাদ।[১]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'দো দাহান্ দারেম গোইয়া, হাম চুঁ মায়।' কবিপ্রাণ বাঁশরীতুল্য—তার এক প্রান্তে সুর তুলে ডাক দেন পরমাত্মা, অপর প্রান্তে তাই সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হয়। মানবাত্মা সে সুর শুনে বিমুগ্ধ হয়, পরমানন্দ লাভ করে।[২] বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের বাঁশীকে ঠিক এরূপ প্রতীক অর্থে গ্রহণ করেননি। তবে জীবলোকে বংশীধ্বনির বিমুগ্ধ প্রভাব তাঁরাও স্বীকার করেছেন। এখানে বাঁশী জীবাত্মা-পরমাত্মার সুরময় সংযোগসেতু রচনা

১। মুহম্মদ বরকতুল্লাহ—পারস্য প্রতিভা, পৃঃ ২৯৭
২। ঐ, পৃঃ ২৯২

করেছে।[১] কৃষ্ণের মুরলীরব রাধিকার চিত্তে প্রেমের ঢেউ তুলে জোয়ার এনে দেয়; সংসারের মোহবন্ধনে ও কর্তব্যের জালে জড়িত মানবচিত্তকে জাগ্রত করে দেয়। রাধার জীবনে সেইরূপ ঘটেছে। তিনি যখন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনেছেন তখন বিবশ-ব্যাকুল হয়ে গেছেন; তাঁর রান্নার কাজ থেমে যায়, কেশবিন্যাস অসমাপ্ত থাকে। শ্যামের বাঁশী তাঁর প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দেয়:

ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না।
ও যে বাহিরে বাজিল বাঁশী, বলো কি করি?

রাধার এরূপ চিত্তব্যাকুলতার কারণ—বাঁশীর সুর কেবল শ্রবণকে মুগ্ধ করেনি, মর্মে প্রবেশ করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এজন্য আমরা বলেছি, সুফী ও বৈষ্ণব কল্পনায় বাঁশীর একই ইফেক্ট।

আলী রজা বাঁশীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লিখেছেন,

বংশী হেন মূর্তি ধরে তনু রাখি প্রাণ হরে
বংশী মূলে জগতের চিত।

অথবা

যার নাম বেদশাস্ত্র অক্ষরে না ধরে।
পরম বংশীর সনে সে নাম নিঃসরে॥

অথবা

করুণ বংশীর স্বরে দেব মুনি জ্ঞান হরে
যার হৃদে জাগে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণ বংশী সুর জ্ঞান গর্ব করে দূর
জাতি-ধর্ম-লাজ-কুল-মান॥

১। স্বরূপ গোস্বামী বাঁশীকে মাধ্যম হিসাবেই কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে ধনু ও বাঁশীর উৎস এক; ধনুর শরাঘাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে, সর্ব দুঃখ-তাপ নির্ব্যাপিত হয়; বাঁশীর স্বরাঘাতে মানুষ মরে না, কিন্তু দুঃখ-তাপানলে দগ্ধ হয়। এজন্য বাঁশী নয়, ধনু তাঁর কাছে বন্দনার যোগ্য।

স্পষ্টতঃ এ বাঁশী শ্যামের মুরলীমাত্র নয়, মুসলমান কবিগণ এতে অপ্রাকৃত সত্তা ও অলৌকিক শক্তি আরোপ করেছেন। বাঁশী সম্পর্কে তাঁদের ধারনাই ভিন্ন। এরশাদউল্লা লিখেছেন,

উপরে মুড়া তাতে সপ্ত দ্বার
বেদ দ্বারে সুরধ্বনি।
দক্ষিণ উত্তরে এ যুগ তুয়ার 'পরে
বাজায় বংশী শুনি॥
যত মুনি ঋষি নিত্য বাজায় বাঁশী
আপে গুরু সূক্ষ্ম ধ্যানী।
তত্ত্ব পন্থ সার বংশী বিনে আর
নাহি জানে শুদ্ধ জ্ঞানী॥

আমরা আগেই বলেছি, মুসলমান কবিরা সম্ভোগপূর্ণ আদিরসের পদ লিখেননি। তাঁদের অভিসার-মিলনের পদ আছে; পদগুলিতে প্রেমপিপাসা ও রূপতৃষ্ণা বেশী ফুটেছে। অভিসারের একটি পদে গোলাম হোসেন বলেছেন, 'রাই রূপের ভোমরা দেখিলে জীবন ধরে না দেখিলে মরা।' 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে'র পদকে বৈষ্ণবেরা শ্রেষ্ঠ বলেছেন। স্বপ্নে মিলন, ভাবোল্লাস, বিপরীত মিলন, একত্রে নিদ্রাবস্থা, স্বাধীনভর্তৃকা ইত্যাদি পদগুলি এর শ্রেণীভুক্ত।[১] অনেক পদে যৌনমিলনের স্থূল চিত্র আছে। নরনারীর দেহমিলনেই প্রেমোপলব্ধির চরম অবস্থা। মুসলমানরা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক আরোপ করে মিলন কামনা করলেও দেহ সম্ভোগের স্থান সেখানে নেই। ফারসী সুফী সাহিত্যে দেহমিলনের চিত্র নেই: লায়লীমজনু, খরুন-শিরীন, সলমান-অবসাল অনন্ত বিরহের কাব্য। ইউসুফ-জোলেখায় অপ্রাকৃত মিলন চিত্র আছে, অলৌকিক উপায়ে জোলেখাকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে বিবাহের দ্বারা মিলন দেখান হয়েছে। বৈষ্ণবমতে পরকীয়া প্রেমই

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩০

উত্তম। রাধাকৃষ্ণের ভাল বিরহ পদ আছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা এখানে থামেননি, রাধার স্বপ্নবিভোরতায় এবং আত্মবিস্মৃতির অর্ধোন্মাদনায় উভয়ের 'ভাবসম্মেলন'মূলক পুনর্মিলনের পদও লিখেছেন। তাঁরা ভারতীয় প্রেমধারার অনুকূলেই এ চিত্র এঁকেছেন। সুফীগণ দেহমিলনকে মোটেই প্রশ্রয় দেননি, বরং দেহকেই মিলনের বাধা স্বরূপ মনে করেছেন। দেহকে ধ্বংস করে, অহংকে বিনষ্ট করে প্রেমাস্পদের সহিত আত্মিক মিলনকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। নফ্‌সের ধ্বংসসাধন করতে পারলেই তবে বাকাবিল্লাহ সম্ভব। সাধক শ্রেষ্ঠ মৌলানা রুমী বলেছেন,

শাহে জান মর জেসম্‌রা বীরাঁ কুনাদ।
বাদ বীরা নিশায় আবাদাঁ কুনাদ॥

আত্মারূপ সম্রাট প্রথমে দেহরাজ্যকে ধ্বংস করেন, তারপর সেই শুদ্ধ ভূমিতে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।[১] ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমান কবিরা এ আদর্শেই পদ রচনা করেছেন। যে দু একটা পদে 'শারীরিকতা' প্রকাশ পেয়েছে তাতে বৈষ্ণবধর্ম বা সুফীমত কোনটাই নেই, আছে লৌকিক প্রেম।

'আত্মবোধনে'র পদগুলি মুসলমানদের নিজস্ব চিন্তার ফসল। এগলিতে প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। আহমদ শরীফ সাহেব এগুলিকে 'জীবন-জিজ্ঞাসা'র পদ বলেছেন।[২] ভিন্ন কথায় একে সুফীপ্রেমদর্শন বলা যেতে পারে। বাংলার কবিরা ভারতীয় ও ইরানীয় প্রেমধর্মের মিশ্রিত ধারায় যে তত্ত্বলোক গড়ে তুলেছেন তারই পরিচয় আছে এগুলিতে। অর্থাৎ পদগুলিতে যোগতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কোন কোন পদে রাধাকৃষ্ণের নাম নিছক রূপক মাত্র; সাধারণভাবেই পদটির তত্ত্বার্থ ধরা পড়ে। অধিকাংশ পদে রাধাকৃষ্ণের নামই নেই। সৈয়দ সুলতান ও সৈয়দ মর্তুজার পদগুলিতে যোগসাধনার স্পষ্ট রূপ দেখা যায়। সৈয়দ সুলতান লিখেছেন,

---

১। উদ্ধৃতি ও ভাবার্থঃ দ্রষ্টব্য, পারস্য প্রতিভা, পৃঃ ২৮০

২। মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, পৃঃ ৩৬

কায়া মোর কামিনী হইয়াছে সিদ্ধার বাণী
মুরশিদ ভজিলুঁ একজনা।
পাইয়া ব্রহ্মার ভেদ চতুর্দিকে কৈলুঁ ছেদ
রবি-শশী আমনা-গমনা ॥[১]

অথবা

নাছুত আতস ঘর লাহুতেত ঢেউ বড়
নৌকা খান চলে বারে বারে।
মলকুত বাজারে হাট জবরুত মোকামে বাট
নীল নদী বহে চারিধারে ॥ [২]

সৈয়দ মর্তুজা লিখেছেন,

কালা-ধলা দুই জনা বসিয়া রইছে বাটে।
কিরূপে হইমু পার ত্রিবেণীর ঘাটে ॥
কেশের ধরণী রে সাঁকো ক্ষুরের যে ধার।
যে বান্দা করিছে নেকি তুরিতে হৈব পার ॥[৩]

সৈয়দ আইনুদ্দিন লিখেছেন,

জ্বালাইয়া রাখ রে বাতি জীবা যত দিন।
তিরহিতে ফুক দিলে ত্রিবেণী সন্ধান ॥
পবন উদ্দেশ্যে কায়া আয়ু পরিমাণ।
ভাটিতে গমন হইলে ধরিও উজান ॥···
ঘট মধ্যে তিনগুণ কায়া-সুধা মাটি।
সাধকে সাধিলে কায়া না পড়িব ভাটি ॥[৪]

উদ্ধৃতিগুলিতে বৈষ্ণবধর্মের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। যোগভিত্তিক সুফীতত্ত্বই পদগুলির আশ্রয়। যোগসাধনা ও সুফীসাধনার পরিভাষা দিয়ে তা স্পষ্টতঃই

১। ঐ, পৃঃ ১২২
২। ঐ, পৃঃ ১২২-২৩
৩। ঐ, পৃঃ ১১৯
৪। ঐ, পৃঃ ১২৮

ব্যাখ্যাত হয়েছে। কতক পদে ভবমুক্তি, পরকালচিন্তা ও ঈশ্বরাশ্রয়িতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। মীর ফয়জুল্লার এরূপ একটি পদ ঃ

জাগ জাগ অরে মনুরা কত নিদ্রা যাও।
অরুণ সে না উঠিতে আল্লাকে ধেয়াও ॥
নিদ ভেল নয়ানেত পাসরি নিরঞ্জন।
কাল পাই চোরাই নিব সর্বধন ॥
নিদেতে গোঞাইবা কাল ভাবি চাহ সার।
রজনী না হতে ভোর ভাব করতার ॥
মীর ফয়জুল্লা কহে জনম রহিল।
ভাবিতে ভাবিতে কহি জগ টলমল ॥[১]

সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে রচিত সৈয়দ আইনুদ্দিনের একটি পদ এরূপ ঃ

জাগরে অবোধ মন জগতে প্রভাতে।
ইব্লিস পাতকী সবে ফিরে সাথে সাথে ॥
জাগিয়া প্রভুর সেবা এক মনে কর।
মরি কালে তুমি সব আগে মর ॥
জীবন থাকিতে যদি পার মরিবার।
তবে কাল যম হস্তে ভয় নাহি আর ॥
নূরের ফিরিস্তা আসি বাঁটি যায় নূর।
শয্যা সুখে নিদ্রা যাও এ কি ব্যবহার ॥···
কহে সৈয়দ আইনুদ্দিনে হামো ভোর মতি।
নিশি অবশেষ হৈল না ভজিলাম পতি ॥[২]

এগুলি প্রকৃতিপক্ষে ভজন বা জিকিরের পদ। সুফীর 'জীয়ন্তে-মরা'র অধ্যাত্মতত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ এতে আছে। আত্মবোধনের অধিকাংশ পদ এ সুরেই বাঁধা। পূর্বাপর এসব কারণেই আমরা এগুলিকে 'সুফী পদাবলী' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

১। ঐ, পৃঃ ১২৪
২। ঐ, পৃঃ ১২৭